The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাসে মানব মনের গভীরতা, সংঘাত এবং স্বপ্নভঙ্গের চিত্রণ: একটি মনস্তাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণ

Md Reajul Islam
Former Student, Dept. of Bengali, West Bengal State University, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400025*

Abstract

জীবনবাদী ও পল্লী দরদী লেখক বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯২৯ সালে প্রকাশিত কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি, যা গ্রামীণ বাংলার দারিদ্র্যপীড়িত জীবনকে কেন্দ্র করে মানব মনের অতল গভীরতা, অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত সংঘাত এবং স্বপ্নের অবশ্যম্ভাবী ভঙ্গের এক অপূর্ব চিত্রণ উপস্থাপন করে। এই গবেষণা প্রবন্ধে উপন্যাসটিকে মনস্তাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সংবেদনশীল ভাষা মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতকে প্রকৃতি, দারিদ্র্য এবং মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে তুলে ধরেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি—হরিহর রায়, সর্বজয়া, দুর্গা, অপু এবং ইন্দির ঠাকুরুন—মানব মনের গভীরতাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের প্রকৃতি ও দারিদ্র্য তাদের মনকে সংঘাতপূর্ণ করে তোলে এবং স্বপ্নগুলিকে নির্মমভাবে ভেঙে চুরমার করে। গবেষণার উদ্দেশ্য হলো দেখানো যে, বিভূতিভূষণ শুধু গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেননি, বরং মানব মনের অচেতন স্তর, স্বপ্নের সংঘাত এবং মৃত্যুর মাধ্যমে স্বপ্নভঙ্গের দার্শনিক মাত্রা উন্মোচিত করেছেন, যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য অবদান।

উপন্যাসের পটভূমি নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের জীবন। হরিহর রায়, একজন পুরোহিত ও স্বপ্নদ্রষ্টা লেখক, তার পরিবারকে নিয়ে সংগ্রাম করেন। সর্বজয়া, তার স্ত্রী, দারিদ্র্যের চাপে ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ইন্দির ঠাকুরুন, এক বৃদ্ধা বিধবা আত্মীয়া, তাদের আশ্রয় নেন কিন্তু সর্বজয়ার সঙ্গে তার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই বহির্গত সংঘাত মানব মনের গভীরতাকে উন্মোচিত করে সর্বজয়ার মনে দারিদ্র্যের কারণে জন্ম নেওয়া অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। মৃত্যু শুধু শারীরিক নয়, মানসিকভাবে মনকে একাকী করে দেয়। ভারতীয় দর্শনের আলোকে মৃত্যুকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের উক্তি—"মৃত্যু আলো নিভিয়ে দেয় না, শুধু প্রদীপ নিভিয়ে দেয় কারণ ভোর হয়েছে"

দুর্গা ও অপুর শিশুমনের গভীরতা উপন্যাসের মূল স্তম্ভ। দুর্গা ছয় বছরের অস্থির ও নির্দোষ মেয়ে। গল্প শুনে, জঙ্গলে ঘুরে এবং ফল-ফুল চুরি করে তার অচেতন মনের কৌতূহল প্রকাশ করে। দুর্গা অপুকে রক্ষা করে ঝড়ে, কিন্তু নিজের খেলনা চুরি করে লুকিয়ে রাখে—এটি মনের অভাববোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংঘাত। দুর্গার মৃত্যু—হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত—স্বপ্নভঙ্গের চরম উদাহরণ। তার স্বপ্ন ছিল ট্রেন দেখার, কিন্তু মৃত্যু তা চিরতরে ভেঙে দেয়। অপুর মনে এই মৃত্যু গভীর ছাপ ফেলে তার শৈশবের নির্মলতা নষ্ট হয়, মনের গভীরতায় অস্তিত্বের শূন্যতা জন্ম নেয়। হরিহরের চরিত্রে মানব মনের স্বপ্নদর্শী দিক প্রকাশ পায়। তিনি লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু দারিদ্র্য তাকে পুরোহিত করে রাখে। তার অভ্যন্তরীণ সংঘাত পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত স্বপ্ন উপন্যাসে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত। সর্বজয়ার মনে এই সংঘাত আরও তীব্র: "আমার অনেক স্বপ্ন ছিল একদিন"—এই উক্তি দারিদ্র্যের চাপে স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক। পরিবারের কাশী যাত্রা আধুনিকতার আশা নিয়ে আসে, কিন্তু অতীতের স্মৃতি মনকে সংঘাতপূর্ণ করে রাখে। প্রকৃতি এখানে মনের আয়না -বন-জঙ্গল, ঝড়-বৃষ্টি শিশুদের স্বপ্নকে পুষ্ট করে, আবার মৃত্যুর মাধ্যমে ভেঙে দেয়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Keywords: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব মন, মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত, স্বপ্নভঙ্গ, অস্তিত্ববাদ, জীবনতৃষ্ণা, গ্রামীণ বাস্তবতা

Introduction

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সরলতা ও জটিলতার মধ্য দিয়ে মানব মনের গভীরতম স্তরগুলিকে উন্মোচিত করে। উপন্যাসটি শুধুমাত্র অপু ও দুর্গার শৈশব-কৈশোরের গল্প নয়, বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতের সংঘাত, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের এক অপূর্ব চিত্রণ। বিভূতিভূষণের সৃজনশীলতা এখানে এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রকৃতি, দারিদ্র্য ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানব মনের অবচেতন প্রবাহ, নৈরাশ্যের ছায়া এবং স্বপ্নের অপূর্ণতা পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বিভূতিভূষণই প্রথম এমনভাবে গ্রামীণ জীবনকে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণনায় প্রকৃতি শুধু পটভূমি নয়, মানব মনেরই একটি অংশ—যেখানে বর্ষার আনন্দ ও অনাবৃষ্টির নিষ্ঠুরতা মানুষের আবেগের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। এই উপন্যাসে সংঘাত কখনো ব্যক্তিগত (মা-মেয়ের সম্পর্ক), কখনো সামাজিক (দারিদ্র্য ও জাতপাত), আবার কখনো অস্তিত্বগত (জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব)। ফলে পথের পাঁচালী শুধু একটি আঞ্চলিক উপন্যাস নয়, বরং সর্বজনীন মানবিক অভিজ্ঞতার দর্পণ।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে চাই যে, পথের পাঁচালী আজও প্রাসঙ্গিক কারণ মানুষের মনের সংঘাত ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি কালোত্তীর্ণ। বিভূতিভূষণের কলমে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অসাধারণ—যেখানে প্রতিটি হারানো স্বপ্ন নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা জাগায়। অধ্যাপক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন –

> "তিনি আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষণপন্থী নন।... তিনি জীবনের উপভোক্তা।.... বিভূতিভূষনের সাহিত্যে
> একদিকে একটি সরল পল্লীপ্রাণ মানুষ – সে সামাজিক, হৃদয়বান, পরদুঃখকাতর, সংযতেন্দ্রিয়;
> অন্যদিকে একটি ঘরভোলা মুগ্ধদৃষ্টি কিশোর।"

এই গবেষণার উদ্দেশ্য সেই নতুন আলো উন্মোচিত করা।

Literature review

পথের পাঁচালী উপন্যাসটিতে মানব মনের গভীরতা , বিভিন্ন স্তরের সংঘাত এবং স্বপ্নভঙ্গের চিত্রণ মূল বিষয়। এই তিনটি উপাদানের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ শুধু গ্রামীণ জীবনের বাহ্যিক চিত্রই আঁকেননি, বরং মানবমনের জটিলতা, আবেগের সংঘর্ষ এবং বাস্তবের নির্মম আঘাতে স্বপ্নের ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরেছেন। সমালোচক ও গবেষকরা এই উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ এর উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বর্তমান সাহিত্য পর্যালোচনায় এই তিনটি থিমের উপর প্রকাশিত গবেষণা, নিবন্ধ ও সমালোচনামূলক আলোচনা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে গবেষণার ফাঁক ও সম্ভাব্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়।

চরিত্রসৃজনে মানবমনের গভীরতার প্রকাশ বিভূতিভূষণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতকে এমন সূক্ষ্মভাবে উন্মোচিত করেছেন যে প্রতিটি চরিত্র মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রতীক হয়ে ওঠে। নির্ঝরিণী ত্রিপাঠী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন ইন্দির ঠাকরুন, সর্বজয়া ও দুর্গার মানসিক যন্ত্রণা, একাকিত্ব এবং অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

চাপে কীভাবে গড়ে ওঠে। সর্বজয়া যিনি দারিদ্র্যের মধ্যেও আত্মসম্মান রক্ষা করে চলেন। ইন্দির ঠাকুরণ বিধবা জীবনের নীরব যন্ত্রণা এবং দুর্গার চঞ্চল, কৌতূহলী মন উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা বৃদ্ধি করে। শিশুমনের বিশ্লেষণে "শিশুমনের আনাচে-কানাচে: প্রসঙ্গ 'পথের পাঁচালী'" নিবন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে অপু ও দুর্গার মনোলোক উন্মোচিত হয়েছে। দুর্গার গল্প-ছড়া শোনানোর পুনরাবৃত্তি এবং অপুর কল্পনাপ্রবণতা শিশুমনের গভীরতা প্রকাশ করে। দুর্গার চুরির প্রবণতা এবং মৌখিক সুখের আচরণ দারিদ্র্যের চাপে শিশুমনের অভ্যন্তরীণ স্তরগুলিকে তুলে ধরে। অপুর একাকিত্ব ও কল্পনার জগৎও এখানে বিশেষভাবে বিশ্লেষিত।

উপন্যাসে সংঘাত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—সব স্তরে বর্ণিত হয়েছে। নির্ঝরিণী ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন যে, সর্বজয়া ও ইন্দির ঠাকরুনের কথার লড়াই, দুর্গার জীবনযাপন এবং সর্বজয়ার পিতৃতান্ত্রিক নির্ভরতার সংঘাত নারীমনের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলে। দুর্গার চুরি ও অবাধ্যতা পারিবারিক দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রকাশ। শিশুমনের নিবন্ধে অপু-দুর্গার ভাই-বোনের সংঘাত এবং দারিদ্র্যজনিত মানসিক সংঘাত ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত। দুর্গার একাকিত্ব এবং অপুর কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত শিশুমনের জটিলতা তুলে ধরে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাতও মৃত্যুর মাধ্যমে চরম রূপ নেয়। এই সংঘাতগুলি গ্রামীণ বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন, যা চরিত্রগুলিকে আরও জীবন্ত করে তোলে।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে স্বপ্নভঙ্গ সবচেয়ে করুণ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। হরিহরের কবি-নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন, সর্বজয়ার সংসারের দারিদ্র মোচনের স্বপ্ন ও দুর্গার বিয়ে-শিক্ষার আশা, দুর্গার ট্রেন দেখার অপূর্ণ ইচ্ছা—সবই দারিদ্র্য ও মৃত্যুর আঘাতে ভেঙে যায়। দুর্গার মৃত্যুর আগের কথা—"আপু, যখন সুস্থ হব তখন একদিন ট্রেন দেখাবি?"— অপুর পরবর্তী কান্না স্বপ্নভঙ্গের চরম উদাহরণ। তবে এই স্বপ্নভঙ্গ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং গ্রামীণ জীবনের সার্বিক অনিশ্চয়তার প্রতীক।

পর্যালোচনার ফাঁক ও গবেষণার সম্ভাবনা

উপর্যুক্ত আলোচনা মূলত চরিত্রকেন্দ্রিক, ফ্রয়েডীয়-নারীবাদী এবং মানবিক বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। তবে মানব মনের গভীরতা, সংঘাত ও স্বপ্নভঙ্গকে একত্রে ভারতীয় দর্শন এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে বিশ্লেষণের সুযোগ এখনও রয়েছে। বর্তমান গবেষণা এই ফাঁক পূরণ করে উপন্যাসের মানবিক বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকে উন্মোচিত করতে পারে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' মানবমনের গভীরতা, সংঘাত ও স্বপ্নভঙ্গের মাধ্যমে জীবনের অনিবার্য যাত্রাকে চিরন্তন করে তুলেছে। উল্লিখিত সমালোচনার এই থিমগুলোর বহুমাত্রিকতা প্রমাণ করে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য সমৃদ্ধ ভিত্তি প্রদান করে।

Data Analysis and Discussion

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের এক অমর কীর্তি। এটি শুধু গ্রামীণ দারিদ্র্যের চিত্র নয়, বরং মানব মনের গভীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে সংঘাত, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের মর্মস্পর্শী চিত্রণ করে। এই প্রবন্ধে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ, শিশুমনের মনস্তত্ত্ব এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের এই তিনটি দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাসের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ প্রমাণ করেছেন যে, জীবনের সংঘাত ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেও মানবমনের গভীরতা অটুট থাকে এবং জীবন চলতে থাকে।দারিদ্র্য এখানে শুধু বাহ্যিক নয়; এটি মনের গভীরে প্রবেশ করে সংঘাত সৃষ্টি করে এবং স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। তবু লেখক দেখিয়েছেন, মানবমনের গভীরতায় লুকিয়ে থাকে এক অদম্য জীবনীশক্তি। এই প্রবন্ধে তিনটি প্রধান অংশে বিশ্লেষণ করা হয়েছে - মনের গভীরতা, সংঘাত এবং স্বপ্নভঙ্গ।

মানব মনের গভীরতার চিত্রণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পথের পাঁচালী' পড়ে মন্তব্য করেন -

> "পথের পাঁচালী বইখানি পড়ে আমি বড়ো আনন্দ পেয়েছি। এর মধ্যে একটি আন্তরিক সত্যের রস আছে। লেখক খুব কাছের থেকে জীবনের অতি সাধারণ জিনিসকে দেখেছেন এবং তাকে মস্ত করে দেখিয়েছেন।" (বিভূতিভূষণকে লেখা চিঠিপত্র থেকে সংগৃহীত ভাবার্থ)

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

রেলগাড়ি দেখার সামান্য বিষয় অসামান্য হয়ে ওঠে অপু ও দুর্গার কাছে। তারা ট্রেন এর কথা শুনেছে, কিন্তু কখনও দেখেনি। এই 'না দেখা' বস্তুর প্রতি তাদের যে আকর্ষণ, তা আসলে মানুষের সহজাত অজানাকে জানার আদিম প্রবৃত্তি। বন-জঙ্গল, জলাভূমি পেরিয়ে তাদের সেই দীর্ঘ যাত্রা কেবল একটি ট্রেন দেখার জন্য নয়, বরং নিজের জগতের সীমানা ছাড়িয়ে নতুনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক মানসিক সংগ্রাম। রেলগাড়ি দেখার অভিযানে অপু ও দুর্গার সম্পর্কের এক গভীর ও কোমল দিক ফুটে ওঠে। বড় বোন হিসেবে দুর্গার দায়িত্ববোধ এবং ছোট ভাই অপুর তার ওপর অগাধ ভরসা—এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। কাশবনের মধ্য দিয়ে দৌড়ানোর সময় তাদের মনে যে উত্তেজনা ও ভয় কাজ করছিল, তা তাদের মানসিকভাবে আরও কাছে নিয়ে আসে। অপু ও দুর্গা যখন অবশেষে রেললাইনের ধারে পৌঁছায়, তখন তারা এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করে।

অপু-দূর্গার চড়ুইভাতি যাবতীয় ভেদজ্ঞান ও সমাজদূরত্বের উর্ধ্বে গিয়ে আমাদের অপরাধী মনেও একটু স্বস্তি এনে দেয়। মনুষ্যসৃষ্ট সংকীর্ণ সমাজ তাদের মনে এখনো ছাপ ফেলতে পারেনি। আর তাই বনভোজনে পাসের গ্রামের যুগীর বামুন নামে পরিচিত বিনি তাদের চড়ুইভাতির মাঝে হঠাৎ চলে এলে দূর্গা সস্নেহে আন্তরিকতাও সাদর অভ্যর্থনা দিয়ে বিনির সব জড়তা অস্বস্তিকে মুছে দিয়েছে এবং ভেদজ্ঞান লুপ্ত করে তাকে আহ্বান করেছে –

"আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি - বোস।" [১]

এর পর একসাথে খেতে বসে বিনির জল পিসাসা পেলে বিনি তাদের পাত্রে হাত দিতে না চাওয়ায় অপুকে একটু জল খাইয়ে দিতে বললে অপু বলে –

"নাও না বিনি দি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না !.... দূর্গা বলে – নে না বিনি,গেলাসটা নিয়ে খা না !"[২]

অপু-দূর্গার মনের গভীরতা কোথায়ও মালিন্যের দাগ পড়তে দেয়নি , বিভেদের এলাকা রাখেনি। সামান্য উপকরণও তারা আন্তরিকতার সাথে একত্রে ভাগ করে খেয়েছে।

সর্বজয়ার প্রতিদিনের জীবন ছিল অভাবের সাথে এক অসম লড়াই। নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা ভিটেয় বসে একবেলা অন্নের সংস্থান করাটাই ছিল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অভাবের সংসারে হরিহর অধিকাংশ সময় বাইরে থাকতেন, আর বাড়িতে সর্বজয়াকে অপু ও দুর্গার মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য লড়াই করতে হতো।এক সময়ের সচ্ছল ঘরের মেয়ে হয়েও ভাগ্যের ফেরে তাকে অতি দারিদ্র্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এই রূপান্তর তার মনে এক ধরণের তিক্ততা তৈরি করলেও তার লড়াই থামেনি। দারিদ্র্য সর্বজয়াকে কাবু করতে পারলেও তার বংশমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধকে ধ্বংস করতে পারেনি। নিজের ঘরের চরম দৈন্যদশা বাইরের মানুষের কাছে প্রকাশ না করার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তার মধ্যে। সে চাইত না কেউ তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখুক। এই দারিদ্রপীড়িত সংসারে থেকেও সে যাত্রা দলের অচেনা ছেলেকে নিজের বাড়িতে এনে সাধ্যমতো ভোজনের ব্যবস্থা করে। সর্বজয়া যখন জানতে পারে ছেলেটি তার প্রানপ্রিয় অপুরই বয়সী আর তার কেউ নেই, তার নিজে রোজগার করে খেতে হয় তখন তার মন গভীরভাবে ব্যথিত হয়। সে ভাবে –

"বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্তে।
অপুর আমার যদি ঐরকম হত – মাগো !...."[৩]

হরিহর রায়ের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভাঙা ভিটে, সর্বজয়ার নিত্যদিনের অভাবের অভিযোগ এবং দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ। এত কিছুর মাঝেও হরিহর যখন তার পুঁথি-পত্র নিয়ে বসে, তখন সে এক অন্য জগতে চলে যায়। তার কাছে সাহিত্য বা নতুন পুঁথি রচনা কেবল জীবিকা নয়, বরং দারিদ্র্যের গ্লানি থেকে মুক্তির একটি পথ। একদিকে চাল-ডালের অভাব, অন্যদিকে তার মাথায় ঘোরে 'দশমহাবিদ্যা' বা নতুন কোনো যাত্রার পালার পরিকল্পনা। এই বৈপরীত্যই তার মনের গভীরতাকে প্রকাশ করে। প্রতিটা বাবার মতো সেও চায় তার ছেলে অনেক বড়ো মানুষ হোক। আর তাই অপু গল্প লিখে প্রকাশ করতে চাইলে দারিদ্রের সংসারে মধ্যেও সে অপুকে জমানো টাকা থেকে টাকা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। উদার মনে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী পুজোতে দূর্গার হাতেও কিছু টাকা দেয়। অনেক বড়ো মনের মানুষ তিনি। নিজের হৃদয় দিয়ে অন্যের প্রয়োজন সহজেই বুঝে নিয়ে সাধ্যমতো তা মেটানোর চেষ্টা করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

হরিহরের মনের গভীরতা বোঝা যায় তার অজানাকে জানার নেশায়। নিশ্চিন্দিপুরের তুচ্ছ গণ্ডি তাকে ধরে রাখতে পারে না। সে মনে করে একদিন তার লেখা প্রকাশিত হবে, সে অনেক অর্থ উপার্জন করবে এবং সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। এই 'একদিন হবে'—এই আশাবাদই তাকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। সংসারের চাপে সে পিষ্ট, কিন্তু মানসিকভাবে সে সর্বদাই ভ্রমণপিয়াসু। তার এই যাযাবর বৃত্তি তাকে ঘরোয়া দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দিলেও তার অন্তরের কবিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। উপন্যাসে দেখা যায়, হরিহর অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাশী যায়, কিন্তু দিনশেষে সে রূঢ় বাস্তবের কাছে পরাজিত হয়। হরিহরের সাহিত্যের স্বপ্ন মূলত তার সন্তানদের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষার সাথে মিশে ছিল। দুর্গার মৃত্যু সেই স্বপ্নের মূলে কুঠারাঘাত করে। আসলে হরিহরের মত মানুষরা সংসারের জন্য নয়, তারা তৈরি হয়েছে স্বপ্নের নীল আকাশে ওড়ার জন্য। কিন্তু মাটির টান আর দারিদ্র্যের শিকল তাদের ডানা ঝাপটানোকেই সার করে দেয়।

ইন্দির ঠাকুরের অসহায় হলেও মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন উদার। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা তার প্রমান পাই। দূর্গার সামনে বসে দূর্গাকে না দিয়ে চালভাজা খেয়ে ফেললে বলে –

"ও মা, তোর জন্য দুটো রেখে দেলাম না? – এই দ্যাখো।[৪]

তবে দূর্গাকে চাল ভাজা দিতে না পারলেও দুটো পাকা বীচে কলার একটা থেকে আধখানা ভেঙে দূর্গাকে দেয়। এর পর সর্বজয়া তাকে তাড়িয়ে দিলে দূর্গা লুকিয়ে দেখা করতে গেলে বাড়িতে সবাই কেমন আছে তার খবর নেয়। সর্বজয়া তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে কোনো আক্ষেপ প্রকাশ করে না। জীবনানন্দ দাসের কথাতেই বলা যায় –

"অদ্ভুত আঁধার এক পৃথিবীতে এসেছে আজ;
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা।"

সর্বজয়া ইন্দির ঠাকুরণকে তাড়িয়ে দিলেও গ্রামের মানুষজন ই তাকে থাকার একটু ব্যবস্থা করে দেয় , এবং তার সখের চাদরও কিনে দেয়।

মানব মনের সংঘাত চিত্রণ

অপু এবং দুর্গা—এই দুই চরিত্রের মাধ্যমেই উপন্যাসে শৈশবের নির্মল কল্পনা আর দারিদ্র্যের সংঘাত সবচেয়ে প্রকট। অপুর শিশুমন সবসময় অজানাকে জানার নেশায় মত্ত। রেললাইন দেখার অদম্য ইচ্ছা বা বনের ভেতরের রোমাঞ্চকর জগতের স্বপ্ন তার মনে এক মায়াবী জগৎ তৈরি করে। কিন্তু অভাবের সংসার এবং মায়ের শাসনের কড়াকড়ি বারবার তার সেই স্বপ্নের জগতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একজন মা হিসেবে তিনি চান সন্তানদের ভালো রাখতে, কিন্তু চরম দারিদ্র্য তাকে খিটখিটে ও রূঢ় করে তোলে। তার মনের ভেতরকার সংঘাত হলো—একদিকে আভিজাত্যের স্মৃতি এবং অন্যদিকে পরের বাড়িতে ঘটি বাটি বন্ধক রাখার অপমান। প্রমথনাথ বিশি মন্তব্য করেছেন –

"সর্বজয়ার চরিত্রটি হলো বাংলার শাশ্বত জননীর এক ট্র্যাজিক রূপ। তার মনের সংঘাত
একদিকে অভাবের তাড়না, অন্যদিকে সন্তানের জন্য এক চিলতে সুখের আকাঙ্ক্ষা—এই দুইয়ের
টানাপোড়েনেই উপন্যাসটি সজীব।" (বিভূতি-বিচিত্রা)

সর্বজয়ার মনের জটিলতা সবথেকে বেশি প্রকাশ পেয়েছে প্রৌঢ়া ইন্দির ঠাকুরণের সাথে তার দ্বন্দ্বে। দারিদ্র্য মানুষকে কখনও কখনও কঠোর করে তোলে। নিজের সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার তাগিদে সর্বজয়া ইন্দির ঠাকুরণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। এটি আসলে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, বরং সম্পদের অভাব ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তাকে এমন কঠোর হতে বাধ্য করেছিল। যদিও উপন্যাসের শেষে সর্বজয়া নিজ মনের গভীরতা দিয়েই বুঝতে পারে ইন্দির ঠাকুরনের প্রতি তার খারাপ ব্যবহারের কথা। লেখকের ভাষায় সর্বজয়ারকে আমরা দেখি –

"সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাকুরন, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়ে পরা।....তুচ্ছ একটা
নোনা ফলের জন্য কত অপমান।....সেই বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

দীন মৃত্যু.....।

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বা বার

মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল"[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - "মানুষের মন যে কত বিচিত্র এবং তার রহস্য যে কত গভীর,

তাহা মানুষ নিজে যখন সংকটে পড়ে তখনই কেবল বুঝিতে পারে।"

উপন্যাসের শেষে সর্বজয়া এক বিষণ্ণ ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়। মেয়ের মৃত্যু তাকে মানসিকভাবে ভেঙে চূর্ণ করে দেয়। যে মেয়ের জন্য সে সারা জীবন লড়াই করল, তাকেই সে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা খাদ্যে হারিয়ে ফেলে।

উপন্যাসে বিষাদ ও প্রাপ্তির এক লুকোচুরি খেলা চলতে দেখা যায়। হরিহর স্বপ্ন দেখে একদিন পৈতৃক ভিটায় সুখে থাকবে, কিন্তু কর্মহীনতা এবং অনিশ্চয়তা তাকে বারবার পরাজিত করে। তার মনের দ্বন্দ্ব হলো—নিজের সাহিত্য সাধনা বজায় রাখা নাকি পরিবারের অন্নের সংস্থান করা।

ইন্দির ঠাকুরণ সংসারের এক কোণে পড়ে থাকা এই বৃদ্ধার অস্তিত্বের লড়াই অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঘটি বাটি নিয়ে ভিটা ত্যাগ করা এবং আবার ফিরে আসার আকুলতার মধ্য দিয়ে তাঁর মনের অভিমান ও নিরাশ্রয় অবস্থার তীব্র সংঘাত ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন প্রকৃতি যেমন দাতা, তেমনি সে নিষ্ঠুর। অপু-দুর্গার মনে প্রকৃতির অপার বিস্ময় আনন্দ দেয়, কিন্তু সেই প্রকৃতিই আবার বৃষ্টির অঝোর ধারায় দুর্গার মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আসে। প্রিয় মানুষের মৃত্যু আর বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রাম ছাড়ার যে মানসিক যন্ত্রণা, তা উপন্যাসের শেষভাগে এক গভীর বিষাদময় সংঘাত সৃষ্টি করে।

স্বপ্নভঙ্গের চিত্রণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' পথের পাঁচালী' কেবল এক চিরন্তন শৈশবের গল্প নয়, এটি আসলে অনেকগুলো স্বপ্নভঙ্গ আর রূঢ় বাস্তবতার এক মরমী দলিল। উপন্যাসের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের শান্ত প্রকৃতির পাশাপাশি অভাবের যে করাল গ্রাস দেখা যায়, তা-ই চরিত্রগুলোর স্বপ্ন চুরমার হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। টি .এস .এলিয়ট বলেছেন –

"এভাবেই জগতের সমাপ্তি ঘটে; বড় কোনো বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে নয়,

বরং একটা দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে।"

অপু ও দুর্গার কাছে পৃথিবীটা ছিল রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা। রেলগাড়ি দেখার স্বপ্ন তাদের দুজনেরই দীর্ঘদিনের। কিন্তু যেদিন তারা প্রথম সেই স্বপ্নপূরণের সুযোগ পেল, সেদিন বন-বাদাড় পেরিয়ে রেললাইনের ধারে পৌঁছেও অপু দেখল শুধু রেলের চাকা আর ধোঁয়া। পরে অপু যখন ট্রেন দেখে তখন দুর্গা পাশে ছিল না। ছোট এক চিলতে স্বপ্ন সার্থক হলেও তার পূর্ণতা অধরাই থেকে যায়। এছাড়া তারা দুই ভাইবোন পানফল তুলতে গিয়ে হীরারূপি কাঁচকে পেয়ে ক্ষনিকের জন্য দারিদ্র্য মোচনের স্বপ্ন দেখলেও শেষে তা নিরাশায় পর্যবসিত হয়।

হরিহর ছিলেন আদর্শবাদী এবং কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। তিনি স্বপ্ন দেখতেন পূর্বপুরুষের ভিটেয় সুখে থাকবেন। অনেক শিষ্য জুটবে তার, তিনি পাণ্ডিত্য দিয়ে দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন ,তাঁর সমস্ত পাণ্ডিত্য আর স্বপ্ন কেবল দেনার জালে আটকা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর আজন্মলালিত "স্থায়ী নীড়"-এর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন

"বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন যে, মানুষের মন কেবল পেটের দায়ে নয়, বরং আত্মিক ক্ষুধার

তাড়নায় ছটফট করে। হরিহরের নিশ্চিন্তপুর ত্যাগ করার সিদ্ধান্তটি আসলে তার বাস্তব

অভাবের কাছে স্বপ্নের পরাজয়।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ৪র্থ খণ্ড)

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সর্বজয়ার স্বপ্ন ছিল খুবই সাধারণ—একটু দুমুঠো ভাতের নিশ্চয়তা আর সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ। সে চেয়েছিল সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে, কিন্তু অভাব তাকে বারবার ছোট করেছে। চুরির অপবাদ বা তুচ্ছ কারণে সেজবউয়ের গঞ্জনা তার আত্মমর্যাদার স্বপ্নকে বারবার ভেঙে দিয়েছে। তার স্বপ্ন ছিলো নিজের ছেলে-মেয়ের সুখে থাকতে দেখা। আর তাই নিরেনের সাথে দূর্গার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে সে উৎসাহিত হয়। কিন্তু নিরেন অন্নদা রায়ের সাথে ঝামেলা করে চলে গেলে সর্বজয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়। লেখকের ভাষায় –

"খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হল – সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ি ডেকে আনলো, জিনিসপত্তর নিয়ে চলে গেল। সর্বজয়া কথাটা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল।"[৬]

সর্বজয়া দরিদ্র সংসারের সামান্য গৃহিনী মাত্র। তার ভাবনার গন্ডী সামান্য। তাই সে ভাবে তার ছেলে অপু বড়ো হয়ে পন্ডিত হবে। গ্রামের লোক তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গ্রামের পূজোর দায়িত্ব দিয়ে দেবে। তবে এই ছোট্টো আশাটুকুও তার সার্থক হয় না। পাশের গ্রামের একজন হরিহরের কাছ থেকে পৈতে নেওয়ার কথা বললে সর্বজয়া তা নিয়েও আশায় বুক বাঁধে। অভাবের সংসারে কিছু স্বচ্ছলতা আসবে ভেবে। তবে শেষে তারা পৈতে না নিলে লেখকের ভাষায় –

"সর্বজয়া খুব আশায় ছিলো, শুনে একেবারে ভাঙিয়া গেলো।"[৭]

দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটি ভেঙে যায়। সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন :

"দুর্গার মৃত্যু শুধু একটি চরিত্রের বিদায় নয়, এটি অপুর জগতের সেই প্রথম বড় ফাটল যেখানে সে অনুভব করল যে জীবন কেবল বিস্ময় নয়, জীবন মানে অকাল বিয়োগ এবং অপ্রাপ্তিও।"

শেষে অপুকে নিয়ে ভালো থাকার যে লড়াই সে চালিয়েছিল, তবে তা বারেবারে দারিদ্র্যের কশাঘাত জর্জরিত হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে ইন্দির ঠাকরুনের স্বপ্নভঙ্গ আমাদের নাড়িয়ে দেয়। নিজের আপন বলতে কেউ নেই, কেবল এক টুকরো মাথা গোঁজার ঠাঁই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ বয়সে সর্বজয়ার রূঢ় আচরণ আর ঘরের বাইরে অবহেলিত অবস্থায় মৃত্যু তাঁর সেই শেষ আশ্রয়টুকুর স্বপ্নকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

'পথের পাঁচালী'র স্বপ্নভঙ্গ আসলে কোনো নাটকীয় পরাজয় নয়, বরং এটি জীবনের এক অনিবার্য সত্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা 'উপন্যসে ওই একই কথাই বলেছেন –

"সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, ... পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।"

আসলে মানুষ যা চায় তার অধিকাংশই অধরা থেকে যায়। মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায় যেভাবে নিজের জীবন চালনা করতে চায় তার গা ঘেঁসেও যায় না। আর এটাই জীবনের অনিবার্য সত্য।

Conclusion

আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এখানে কোনো নায়ক-খলনায়কের দ্বন্দ্ব নেই; আছে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার অবিরাম সংঘাত। আজও যখন আধুনিক জীবনের জটিলতায় আমরা নিজেদের স্বপ্ন ও সংঘাতের মধ্যে হারিয়ে যাই, তখন এই উপন্যাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবনের গভীরতম সত্যটি লুকিয়ে আছে ঠিক সেই স্বপ্নভঙ্গের মুহূর্তেই, যেখান থেকে নতুন করে বেঁচে ওঠার শক্তি জন্ম নেয়। বিভূতিভূষণের এই মহান সৃষ্টি তাই শুধু বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার এক অমূল্য উত্তরাধিকার। তাঁর বর্ণনায় মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতগুলো উচ্চকিত নয়, বরং অত্যন্ত ধীর ও সহজাত। মানুষের আয়ু যে ফুরাইয়া যায়, স্বপ্নও যে ভাঙে—এ মহা সত্যই উপন্যাসের মূল সুর। পরিশেষে অজিত দত্তের মন্তব্য দিয়েই এই গবেষনার ইতি টানা যেতে পারে -

"পথের পাঁচালীর শেষে যখন অপু ও হরিহর গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তখন সেই যাত্রা কেবল স্থান পরিবর্তন নয়, তা হলো এক পরিচিত জগতের স্বপ্নের সমাধি এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পথে এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রা।"

Endnotes

১ . পথের পাঁচালী – বিংশ পরিচ্ছেদ

২. পথের পাঁচালী – বিংশ পরিচ্ছেদ

৩. পথের পাঁচালী – একবিংশ পরিচ্ছেদ

৪. পথের পাঁচালী – একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

৫. পথের পাঁচালী – প্রথম পরিচ্ছেদ

৬. পথের পাঁচালী – একবিংশ পরিচ্ছেদ

৭. পথের পাঁচালী – দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

References

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ন, কথাসাহিত্য, ঘোষ ও মিত্র পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৫।

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও ঘোষ, সুমথনাথ, বিভূতি-স্মৃতি, ঘোষ ও মিত্র পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৩৩।

বিশি, প্রমথনাথ, বিভূতি-বিচিত্রা, ঘোষ ও মিত্র পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৬।

দাস, জীবনানন্দ, অদ্ভুত আঁধার এক, সাতটি তারার তিমির, ভারবী, ১৯৪৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, যোগাযোগ, বিশ্বভারতী, ১৯২৯।

টি .এস .এলিয়ট, দ্যা হলো ম্যান, ১৯২৫।

সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

দত্ত, অজিত, জনান্তিকে, দেজ পাবলিশিং, ১৯৬০।

সত্যজিৎ রায়, বিষয় চলচ্চিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'পুতুল নাচের ইতিকথা ' -বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ১৯৩৬

All rights reserved. © 2026